International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-X, Issue-IV, July 2024, Page No.39-45
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
10.29032/ijhsss.vol.10.issue.04W.005

যোগ দর্শন মতে যোগ ও স্বামী বিবেকানন্দের মতে যোগ-এর তুলনামূলক আলোচনা

ড. টুসি ভট্টাচার্য্য
সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, ধ্রুবচাঁদ হালদার কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

The main subject-matter of Yoga Philosophy is Yoga. Here, it has been stated that Yoga is the cessation of mental modification. Thus, it has been stated in the verse—'Yogaścittavrittinirodhah'. In the verse there we find four terms viz. Yoga, citta, vritti and nirodha. Yoga is divided into two parts in the Yoga Philosophy viz. Samprajnata Samadhi and Asamprajnata Samadhi. One pointedness of mind is called Samprojnata Samadhi and complete arrestedness is called Asamprajnata Samadhi. When this Asumprojnata Samadhi is completed, there no modification is remained in that state and at that time self remains in itself. As a result, Kaivalya is attained.

On the other hand, Swamiji means to understand the Yoga as to join and austerity. He had supported the combination of Yoga, viz. Jnana-karma and bhaktiyoga. Though according to him, each path deals us to realize immortality. All the paths are complementary to each other. He says that anybody may reach his main goal to follow any one path mentioned above. The main aim of Yoga is to attain the supreme being. Swamiji has followed also the eight-fold means of Yoga of Patanjali. He has added Jnana, Karma and Bhakti in his theory. Patanjali says regarding Bhakti as Isvara Pranidhana.

Keywords: Yoga, cittavrittinirodha, Samādhi, Swami Vivekananda, Jnanayoga, Bhaktiyoga, Karmayoga, Rajayoga.

যোগ দর্শনের মূল বিষয় হল যোগ। সমস্ত শাস্ত্রই যোগ কথায় পরিপূর্ণ। এই গ্রন্থে এমন কোনো কথা বা প্রসঙ্গ নেই যা সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে যোগ বা যোগ সাধনার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত নয়। যোগ দর্শনে বলা হয়েছে, "যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ"।। (১।২) অর্থাৎ চিত্তের বৃত্তি নিরোধের নাম যোগ। এই সূত্রে চারটি শব্দ আছে — যোগ, চিত্ত, বৃত্তি ও নিরোধ। সূত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝতে গেলে আগে এদের অর্থ জানা আবশ্যক।

'যোগ' শব্দটি 'যুজ্' ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। যার একটি অর্থ হল 'সংযোগ বা মিলিত হওয়া', অন্য অর্থটি হল 'সমাধি'। এখানে দ্বিতীয় অর্থে যুজ্ ধাতুর প্রয়োগ হয়েছে। তাই যোগ অর্থে সমাধি বুঝতে হবে। চিত্ত বলতে প্রকৃতির সাত্ত্বিক পরিণাম, যার ওপর নাম হল বুদ্ধি। সেই বুদ্ধিতে যে সমুদ্রের তরঙ্গমালার মতন অসংখ্য চিন্তাধারার সবসময় উত্থান-পতন ঘটছে তারই নাম হল বৃত্তি। নিরোধ বলতে অবস্থা বিশেষকে

বোঝানো হয়। অর্থাৎ যেরূপ অবস্থা বিশেষে চিত্তবৃত্তিসমূহ আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে নিরুদ্ধ হয়ে যায়, সেই অবস্থাবিশেষের নাম হল যোগ।

এই প্রকার যোগ বা সমাধি প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। এক সম্প্রজ্ঞাত, অপরটি হল অসম্প্রজ্ঞাত। চিত্তের একাগ্রতাবস্থায় হয় সম্প্রজ্ঞাত সমাধি, আর পূর্ণ নিরোধাবস্থায় হয় অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে চিত্তের নিখিল বৃত্তি নিরুদ্ধ হয় না, ধ্যেয়রূপে অবলম্বিত বিষয়ে তখনও চিত্তের চিন্তাবৃত্তি বর্তমান থাকে, আর অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে তাও থাকে না, সমস্ত বৃত্তিই নিরুদ্ধ হয়ে যায়। সম্প্রজ্ঞাত সমাধি সাধনার জন্য যোগীকে যথাক্রমে গ্রাহ্য, গ্রহণ ও গ্রহীতা — এই তিনপ্রকার বিষয় অবলম্বন করতে হয়। যোগী একাগ্রতা শিক্ষার জন্য প্রথমে স্থূল শব্দাদি বিষয় অবলম্বন করেন। তারপর গ্রহীতাকে অবলম্বন করে একাগ্রতা সাধনে অগ্রসর হন। একাগ্রতাকালে চিত্তের অবস্থা ঠিক বিশুদ্ধ স্ফটিকের মতন হয়। স্ফটিক যেমন সামনের বস্তুর প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে নিজেও সেইরূপ হয়ে যায়, বিষয়ান্তর-চিন্তাশূন্য নির্মল চিত্তও ঠিক সেইরূপে উল্লিখিত গ্রাহ্য, গ্রহণ ও গ্রহীতাকে নিরন্তর চিন্তা করতে করতে সেই সেই বিষয়াকার গ্রহণ করে নিজেও যেন সেই স্বরূপ হয়ে পড়ে। অর্থাৎ তখন ধ্যেয় বিষয় ছাড়া চিত্তের আর কোন পৃথক সত্তা প্রতীত হয় না, চিত্ত তখন বিষয়াকারে পরিচিত হয়। চিত্তের এইভাবে অবলম্বিত বিষয়াকারে অনুরঞ্জিত হওয়া — তা যোগশাস্ত্রে সমাপত্তি নামে অভিহিত। সমাপত্তি কেবল সম্প্রজ্ঞাত সমাধি চিত্তেরই স্বাভাবিক অবস্থা বা ধর্ম। এই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি চারভাগে বিভক্ত — সবিতর্ক, সবিচার, আনন্দ ও সাস্মিত। এর মধ্যে বাইরের জগতের কোন একটি স্থূল বিষয় অবলম্বন করে সেই বিষয়ে চিত্তের যে একাগ্রতা অনুশীলন, তার নাম হল সবিতর্ক সমাধি। তার থেকে সূক্ষ্ম তন্মাত্র প্রভৃতি বিষয় অবলম্বন করে যে চিত্তের একাগ্রতা অর্থাৎ তজ্জনিত সাক্ষাৎকার, তার নাম হল সবিচার সমাধি। তার চেয়েও সূক্ষ্মতর ইন্দ্রিয়রূপ বিষয় অবলম্বনে যে চিত্রের একাগ্রতা তার নাম সানন্দ সমাধি। আর বুদ্ধির সাথে পুরুষের যে অভিন্নতা ভ্রান্তিরূপ অস্মিতা, তা অবলম্বন করে সেই বিষয়ে চিত্তের যে একাগ্রতা, তার নাম সাস্মিত সমাধি। এইভাবে এই চারপ্রকার সমাধি অবলম্বন করেই বস্তুর তত্ত্ব সাক্ষাৎকার হওয়া দরকার। যতক্ষণ পূর্ববর্তী তত্ত্বের প্রত্যক্ষ না হয় ততক্ষণ তা ত্যাগ করে পরবর্তী বিষয় অবলম্বন করতে নেই।

চিত্তের যে রূপ অবস্থায় ধ্যেয় বিষয়টি প্রকৃষ্টরূপে বিজ্ঞাত হয়, সেইরূপ চিত্তাবস্থাই সম্প্রজ্ঞাত শব্দের প্রকৃতিগত অর্থ। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে ধ্যেয় বিষয়ের প্রাধান্য থাকলেও ধ্যান, ধ্যেয়, ধ্যাতা এই তিনটিই চিন্তাপথে পড়ে, তাই এই অবস্থায় জ্ঞানকে ঠিক তত্ত্বগ্রাহক বলতে পারা যায় না এবং তার দ্বারা আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষেরও সম্ভাবনা ঘটেনা। যোগীকে সাধন পথে আরও অগ্রসর হতে হয়, অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিই আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকারের একমাত্র উপায়। এইজন্য সেই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি ও তার উপায় নির্দেশের জন্য বলা হয়েছে বিরাম — এর অর্থ সম্প্রজ্ঞাত সমাধিকালে চিন্তার পরিত্যাগ, অথবা নিখিল চিত্তবৃত্তির সম্পূর্ণ অভাব। এর প্রত্যয় অর্থ কারণ তার বৈরাগ্য। অভ্যাস অর্থ একই বিষয়ে পুনঃ পুনঃ অনুশীলন। পূর্ব অর্থ পূর্ববর্তী কারণ। সংস্কারশেষ অর্থ সম্প্রজ্ঞাত সমাধিজাত জ্ঞানসংস্কারমাত্র যে অবস্থায় অবশিষ্ট থাকে সেই অবস্থাবিশেষ। অন্য অর্থ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। এই সকল কথার সম্মিলিত অর্থ হল এই যে বিরামের কারণীভূত পর বৈরাগ্যের অভ্যাস হতে যার জন্ম এবং যাতে কেবল সংস্কারমাত্র অবশিষ্ট থাকে, কোনরকম চিত্তবৃত্তি থাকে না তাই হল সম্প্রজ্ঞাত সমাধি থেকে ভিন্ন, অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি।

এর অভিপ্রায় হল এই যে, সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে যেমন চিত্তমধ্যে ধ্যেয় বিষয়ক বিভিন্ন চিন্তা থাকে ও প্রতিনিয়ত অনুরূপ সংস্কার ধারা উৎপাদন করতে থাকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে সেরকম কোনো বৃত্তি থাকে না। হৃদয়মধ্যে পুনঃ পুনঃ পর বৈরাগ্যের অনুশীলন করতে করতে সমস্ত চিন্তাবৃত্তিই নিরুদ্ধ হয়ে যায় তখন কেবলমাত্র পূর্বের সংস্কার থাকে। যদিও তা কোনো সংস্কার উৎপন্ন করে না, পরে বিলীন হয়ে যায়। এইজন্য সম্প্রজ্ঞাত সমাধিকে নিরোধ সমাধি ও নির্বীজ সমাধি নামে অভিহিত করা হয়।

যোগীর চিত্তের তারতম্য অনুসারে নিরোধ সমাধিকে আবার দু'ভাগে বিভক্ত করা যায় ভব প্রত্যয় ও উপায় প্রত্যয়। এর মধ্যে যাঁরা প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার প্রভৃতি অনাত্ম বস্তুকে আত্মা মনে করে সেই বিষয়ে নিরোধ সমাধি সাধনা করেন তাদের সমাধিতে ভ্রান্তি থাকায় তাঁরা কৈবল্য লাভে কখনও সমর্থ হন না। নির্ধারিত সময়ের পরে তাঁরা পুনরায় সংসারে প্রবেশ করেন। তাদের সমাধি অবিদ্যা পূর্বক হওয়ায় তা ভব প্রত্যয় নামে অভিহিত হয়। আর অপরদিকে যারা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিলাভের প্রকৃষ্ট উপায়ভূত শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি ও যোগাঙ্গ সমাধির সাহায্যে চিত্তবৃত্তির নিরোধ সম্পাদন করেন, তাদের সমাধির নাম উপায় প্রত্যয়। কারণ তাঁদের অবলম্বিত সাধনগুলি বস্তুতঃ যোগসিদ্ধির প্রকৃষ্ট উপায়। তবে উল্লেখযোগ্য যে সমাধি যোগ ভব প্রত্যয়ই হোক, আর উপায় প্রত্যয়ই হোক, সর্বত্রই চিত্তবৃত্তির নিরোধ থাকা আবশ্যক। কারণ "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" এটাই সমাধির সাধারণ লক্ষণ। এই লক্ষণের বাইরে কোনো যোগ থাকতে পারে না। তাই চিত্তবৃত্তি নিরোধই সব যোগের জীবন। দীর্ঘকালব্যাপী দৃঢ়তর অভ্যাস দ্বারা এই বৃত্তিনিরোধ যখন পূর্ণতা পায়, তখন চিত্তভূমিতে আর কোনো বৃত্তি উদ্ভূত হয় না, পূর্ণ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির আবির্ভাব হয়। এই অবস্থায় পুরুষ (আত্মা) স্বরূপে অবস্থান করলে কৈবল্য প্রাপ্তি বা মুক্তি লাভ ঘটে। এই অবস্থায় জীবের সর্ব দুঃখের অবসান হয়।

সংস্কৃত 'যোগ' শব্দটির একাধিক অর্থ বর্তমান। তবে যোগের আক্ষরিক অর্থ 'যুক্ত হওয়া' বা 'সংযোগ'। আবার যোগ বলতে 'সংযোগ' এবং একপ্রকার তপশ্চর্যা দুই-ই বোঝায়। স্বামী বিবেকানন্দ 'যোগ' শব্দটির মধ্য দিয়ে এই দুই প্রকার বিষয়কেই বুঝিয়েছেন। বিধি-নিষেধ অনুসারে তপস্যা মুক্তিকামী ব্যক্তিকে ঐক্য ও মিলনের অনুভূতি দান করে। বিধি অনুসারে তপশ্চর্যা জ্ঞান সম্বন্ধীয় বা ভক্তি সম্বন্ধীয় বা কর্ম সম্বন্ধীয় হতে পারে, আবার জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি সম্বন্ধীয়ও হতে পারে। স্বামী বিবেকানন্দ জ্ঞান-কর্ম-ভক্তি সমুচ্চয়কেই সমর্থন করেছিলেন। তবে তাঁর মতে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি, সমন্বিত যোগ একপ্রকারের নয়, বরং জ্ঞানমার্গ, কর্মমার্গ, ভক্তিমার্গ এগুলিকে তিনি অমরত্ব উপলব্ধির এক-একটি স্বতন্ত্র পথ বলে দেখিয়েছিলেন। এই পথগুলি একটি অন্যটির পরিপূরক। এখন স্বামী বিবেকানন্দ এই মার্গগুলিকে কিভাবে দেখিয়েছেন তা আলোচনা করে দেখাব।

জ্ঞানমার্গ বা জ্ঞানযোগ: বন্ধন অবিদ্যার কালেই হয় এই উপলব্ধির ওপর ভিত্তি করেই জ্ঞানমার্গ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিবেকানন্দের মতে অবিদ্যা হল বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে অজ্ঞানতা, সদ্ ও অসদের মধ্যে ভেদসাধনের অসামর্থ্যতা। অর্থাৎ জ্ঞান হলে সদ্ ও অসদের মধ্যে ভেদসাধনের সামর্থ্যতা থাকবে। এই জ্ঞান হল ব্রহ্মজ্ঞান, আত্মজ্ঞান ইত্যাদি। তবে এরূপ জ্ঞান শুধুমাত্র শাস্ত্র অধ্যয়ন ও গুরুবাক্য শ্রবণের মাধ্যমেই হতে পারে তা নয়, তা যখন অপরোক্ষ অনুভূতির স্তরে উন্নীত হয় তখন ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞানে পরিণত হয়। এর জন্য ধ্যান ও একাগ্রতার অনুশীলন প্রয়োজন। তবে ধ্যান সহজ প্রক্রিয়া নয়। এর জন্য ঐ বিষয়ের ওপর পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করা প্রয়োজন। এই সময় দেহেন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে ও ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি নিরোধ

করতে হবে। অর্থাৎ দেহ ও মনকে সংযত রাখতে হবে। এইভাবে দৈহিক কামনা-বাসনার অবদমন ও ইন্দ্রিয় চাহিদার নিবৃত্তি প্রয়োজন। স্বামী বিবেকানন্দের মতে এইভাবে নিজেকে উৎসর্গ করে দেওয়াটা জ্ঞানযোগ অনুশীলনের একটা অপরিহার্য অঙ্গ। ধ্যানের প্রারম্ভিক পর্যায়গুলিতে যে কোনো ধ্যেয় বিষয় নির্বাচন করা যেতে পারে। এমনকি বিভিন্ন দৈবিক চরিত্রও গঠন করা যায়। কিন্তু কালের প্রবাহমানতায় এই ধ্যান গভীরতর হয় এবং মুক্তিকামী পূর্ণ্যধ্যান বা সমাধির স্তরে উন্নীত হন। এই স্তরে কোনো চিত্তবিক্ষেপ থাকে না, এমনকি আত্মা ও ব্রহ্মের ভেদ বিলুপ্ত হয় এবং মুক্তিকামীর পূর্ণ ঐক্য বা একত্বের উপলব্ধি হয়। একেই জ্ঞানমার্গ বলে। অর্থাৎ বিবেকানন্দের মতে জ্ঞানযোগ তিন ভাগে বিভক্ত — (১) শ্রবণ – অর্থাৎ আত্মা একমাত্র সৎ পদার্থ এবং অন্যান্য সবকিছু মায়া এই তত্ত্ব শোনা হল শ্রবণ। (২) মনন – সবদিক থেকে এই তত্ত্বকে বিচার করা, (৩) নিধিধ্যাসন – সমস্ত বিচার ত্যাগ করে তত্ত্বকে উপলব্ধি করা। এই উপলব্ধির আবার চারটি সাধন – (১) ব্রহ্মসত্য জগৎ মিথ্যারূপ দৃঢ় ধারণা, ২) সর্বপ্রকারের এষণা ত্যাগ, ৩) শমদমাদি, ৪) মুমুক্ষত্ব। তত্ত্বের নিরন্তর ধ্যান এবং আত্মাকে তার প্রকৃত স্বরূপ স্মরণ করিয়ে দেওয়া এই যোগের একমাত্র পথ। এই যোগ সর্বশ্রেষ্ঠ কিন্তু কঠিনতম। এই যোগ অনেকের বুদ্ধিগ্রাহ্য হতে পারে। কিন্তু অত্যন্ত অল্প সংখ্যক মানুষ এই যোগে সিদ্ধিলাভ করতে পারেন।

ভক্তিমার্গ বা ভক্তিযোগ: এটি ঐকান্তিক উপলব্ধির মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরকে জানার একটি পথ। বিবেকানন্দের মতে এই গভীর ভাবাবেগের ক্ষমতা আছে মানুষের অব্যক্ত শক্তিকে জাগ্রত ও সক্রিয় করে তোলার। এটি অব্যক্ত শক্তিকে এত বেশি সক্রিয় করে তুলতে পারে যে মানুষ নিজে নিজেই ঈশ্বরকে জানতে সমর্থ হয়। সাধারণ প্রেমকে ঐশ্বরিক প্রেমে বা পরম ভক্তিতে রূপান্তরিত করা যায় বলে একে ভক্তিমার্গ বলা যায়। ভক্তের ভক্তির কথা আলোচনা করতে গিয়ে তিনি প্রথমে শ্রদ্ধার কথা বলেছেন। সবাই দেবস্থান সম্পর্কে শ্রদ্ধা করে তার কারণ হল সেইসব জায়গায় ভগবানের পূজা হয়। ঐসব জায়গায় গেলে আধ্যাত্মিক ভাব জেগে ওঠে। আবার ধর্মগুরুদেরও সব দেশের লোক শ্রদ্ধা করে। শ্রদ্ধার মূলে থাকে ভালোবাসা। যাকে আমরা ভালোবাসি না, তার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জাগে না। এরপর আসে প্রীতি। অর্থাৎ ঈশ্বর চিন্তায় সুখ বা আনন্দ পাওয়া যায়। ইন্দ্রিয় তৃপ্তির উপকরণ পাওয়ার জন্য মানুষ সব জায়গায় ছুটে যায়। ঠিক এরকমই ভালোবাসা চাই ভক্তের। এরপর আসে বিরহ। প্রিয় জিনিষের অভাবের জন্য গভীর দুঃখ হল বিরহ। এই দুঃখ সংসারের সকল দুঃখের মধ্যে মধুর। যেমন ঈশ্বরকে পেলাম না বলে মানুষ যখন খুব আকুল হয়ে যায়, অস্থির হয়ে ওঠে, তখনই বোঝা যায় মনে বিরহ এসেছে। এরপর আসে পরাভক্তি। এই সময় ভক্ত যে সব জিনিষ বা যে সব মানুষজন ভালোবাসে না তারা কাছাকাছি এলে অসহ্য মনে করে। ঈশ্বর ছাড়া আর অন্য কোনো কথা সাধকের কাছে বিরক্তিকর বলে মনে হয়। যাঁরা কেবল ঈশ্বর আলোচনা করেন, তাঁদেরকেই ভক্ত বন্ধু বলে মনে করে। যাঁরা অন্য বিষয়ে কথা বলেন তাদের শত্রু বলে মনে হয়। এর পরের পর্যায়কে বলে তদর্থপ্রাণস্থান। এই সময়ে প্রেম পুরুষের ভাবনা হৃদয়ে থাকে বলেই বেঁচে থাকাটা সুখকর হয়ে ওঠে। জীবনকে অতি মধুর বলে মনে হয়। এর পরের পর্যায়ে সাধক সিদ্ধিলাভ করেন। তখন তার প্রকৃতি সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। তিনি পবিত্র হয়ে ওঠেন। তখন তার জীবনের লক্ষ্য পূর্ণ হয়। তবু ভগবানের আরাধনা করার জন্য তিনি বেঁচে থাকেন। এই জীবনের এই সুখ তাঁরা ছাড়তে চান না। ঈশ্বরকে নিরাসক্তভাবে তারা ভক্তি করেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলেন সকল মার্গের মধ্যে ভক্তিমার্গই বেশি সুবিধাজনক ও জনপ্রিয়। এটা মানুষের কাছে স্বাভাবিক এবং অন্যান্য মার্গের মতন বলে, এই মার্গের জন্য মানুষের কোনো বিশেষ দক্ষতা বা গুণাবলীর প্রয়োজন হয় না। এই কারণেই এই মার্গটি সুবিধাজনক।

কর্মমার্গ বা কর্মযোগ: বিবেকানন্দের মতে কর্মযোগ হল কর্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করা। ভালো অথবা মন্দ কর্ম করলে ঐ কর্মের ফল অবশ্যই ভালো বা মন্দ হবে। সৎকর্মের ফল সৎ এবং অসৎ কর্মের ফল অসৎ হবে। মুক্তির কোনো সম্ভাবনা না রেখে আত্মা চিরবন্ধনের জন্য আবদ্ধ থাকবে। কর্মের ভোক্তা দেহ বা মন। আত্মা কখনোই কর্মের ভোক্তা হতে পারে না। কর্ম আত্মার সামনে আবরণ নিক্ষেপ করতে পারে। অবিদ্যা হল অশুভ কর্মের দ্বারা নিক্ষিপ্ত আবরণ। সৎ কর্ম নৈতিক শক্তিকে দৃঢ় করতে পারে এবং এইভাবে নৈতিক শক্তির দ্বারা অনাশক্তির অভ্যাস হয়। নৈতিক শক্তি চিত্ত শুদ্ধ করে। আর ভোগের উদ্দেশ্যে কর্ম করা হলে সেই কর্ম ঐ বিশেষ ভোগটি উৎপাদন করলেও চিত্ত শুদ্ধ করবে না। তাই ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য হয়েই কর্ম করে যেতে হবে। কর্মযোগী এরকম কোনো কর্মানুষ্ঠান করবেন না যা তাঁকে বন্ধনে আবদ্ধ করবে। বিবেকানন্দ বলেন প্রভুর মতন কর্ম করতে হবে। কেউ যদি নিজের স্বার্থের দ্বারা পরিচালিত হয়ে কর্ম সম্পাদন করেন তাহলে তিনি নিজ কামনা-বাসনার ক্রীতদাসে পরিণত হবেন। কর্মযোগীকে অবশ্যই বিষয় বা ভোগ বিরাগী হতে হবে। বিবেকানন্দ গীতার নিষ্কাম কর্মের আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। এই আদর্শ অনুযায়ী কর্মযোগীকে ফলাকাঙ্ক্ষাবিহীন কর্ম করতে হবে। তিনি বলেছেন গীতা কর্মযোগ শিক্ষা দেয়। যোগারূঢ় হয়ে আমাদের কর্ম করে যেতে হবে। এই যোগযুক্ত অবস্থায় অহংবোধ থাকে না। ফলে আমি করছি এই বোধ থাকে না। এইভাবে আমিত্ব ত্যাগ করে যোগযুক্ত চিত্তে কর্ম করলে তা অনন্তগুণ উৎকৃষ্টতর হবে এবং প্রত্যেকেই নিজের জীবনে এটা অনুভব করতে পারবে। বিবেকানন্দ স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে বুদ্ধদেবের জীবন থেকেও দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। নির্বাণ লাভের পরেও বুদ্ধদেব সারা জীবনব্যাপী নিজেকে কর্মে ব্যাহত রেখেছিলেন। তাঁর কর্মসমূহ বৈরাগ্যের আদর্শ স্বরূপ। তিনি জগৎ থেকে পলায়ন করেননি। নির্বাণ কালেও মানুষের মাঝেই ছিলেন। এই সময় তিনি নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে মানুষের কল্যাণের কাজে নিজেকে সর্বদা ব্যস্ত রেখেছিলেন। বিবেকানন্দ বলেন, তিনিই সর্বোত্তম কর্মানুষ্ঠান করেন, অর্থ, যশ প্রতিপত্তির জন্য কর্মানুষ্ঠান করেন না। তবে এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে এরূপ কর্ম অমরত্বের উপলব্ধির সহায়ক হয় কিভাবে? এই বিষয়ে বিবেকানন্দ বলেন অমরত্ব হল সবকিছুর একত্বের উপলব্ধি। এটি সকল প্রকার বন্ধন থেকে পূর্ণমুক্তি। সর্বদা নিঃস্বার্থ কর্মানুষ্ঠান বা জীবনের সকল কর্মে বৈরাগ্যের নিরন্তর অনুশীলন মানুষকে নিজ স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠতে এবং সবকিছুতে একত্বের উপলব্ধিতে সাহায্য করে। বন্ধন যে আত্মার বন্ধন, কামনা-বাসনার বন্ধন। তাই বৈরাগ্যযুক্ত কর্ম এইপ্রকার বন্ধনকে অতিক্রম করতে পারে। এই প্রকার কর্ম করলে কর্মযোগীর চিত্তশুদ্ধি ঘটে এবং তিনি নিজেকে সবকিছুর সাথে অভিন্ন বা এক বলে মনে করেন। এটিই অমরত্বের উপলব্ধি।

রাজযোগ: রাজযোগ হল দেহ-মন সংযমের দ্বারা অমরত্ব উপলব্ধির একটি পথ। এই সংযম জ্ঞানযোগে যে সংযমের কথা বলা হয়েছে তেমন নয়। এটি হল তপশ্চর্যার মাধ্যমে দেহ-মনের সংযম। মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁর 'যোগসূত্র' নামক গ্রন্থে এরূপ যোগের উল্লেখ করেছেন। কারো কারো মতে এটি মুক্তিলাভের পক্ষে নিঃসন্দিগ্ধ, সাক্ষাৎ ও দ্রুততম পন্থা। একারণে একে রাজযোগ বলে। এটি সকল যোগের শ্রেষ্ঠ। ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম উপলব্ধিই এই যোগের লক্ষ্য। এই মার্গে উপলব্ধির পথে বাধা সৃষ্টিকারী বিষয়গুলিকে বা প্রতিবন্ধকতাগুলিকে কঠোরভাবে অবদমন করা হয়। রাজযোগ হল দৈহিক-মানসিক তপশ্চর্যের একটি পন্থা। দেহ-মনের চঞ্চল ও বিক্ষেপমূলক ক্রিয়াকলাপের জন্যই বন্ধন – এই পূর্বস্বীকৃতির ওপর রাজযোগ দাঁড়িয়ে আছে। দেহ-মনের ক্রিয়াকলাপেই আত্মশক্তি ব্যয় হচ্ছে এবং সেই ক্রিয়াকলাপ আত্মায় প্রভাব বিস্তার করছে। সুতরাং দেহ-মনের ক্রিয়াকলাপকে সংযত করতে হবে, তার জন্য একটি সাক্ষাৎ ও শক্তিশালী পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে। এই কারণে রাজযোগে দৈহিক-মানসিক তপশ্চর্যার কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে দৈহিক-

মানসিক, প্রকৃতির কিছু যোগানুশীলন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর চূড়ান্ত পর্যায় হল ধ্যান। কিন্তু পূর্ণ ধ্যানের অনুশীলন সম্ভব নয় যদি না দেহ মন সংগঠনে ব্যক্তির পূর্ণ সংযম থাকে। বিবেকানন্দের মতে এর জন্য প্রয়োজন গভীর আত্মবিশ্বাস এবং দৈহিক ও মানসিক শক্তি। অন্তিম পর্বে যোগী ঈশ্বরের সঙ্গে একত্বের উপলব্ধিতে সহায়ক হয় - এবারে পূর্ণ সমাধির অনুশীলনে সাহায্য করে। স্বামী বিবেকানন্দের ব্যাখ্যায় রাজযোগকে আটভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগ যম অর্থাৎ অহিংসা, সত্য, অচৌর্য, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ। দ্বিতীয় ভাগ নিয়ম অর্থাৎ শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, অধ্যাত্মশাস্ত্র পাঠ ও ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ; তৃতীয় ভাগ আসন; চতুর্থ ভাগ হল প্রাণায়াম; পঞ্চম ভাগ প্রত্যাহার অর্থাৎ মনের বিষয়াভিমুখী গতি নিভিয়ে তাকে অন্তর্মুখী করা; ষষ্ঠভাগ হল ধারণা অর্থাৎ একাগ্রতা; সপ্তম ভাগ ধ্যান ও অষ্টম ভাগ হল সমাধি অর্থাৎ জ্ঞানাগত অবস্থা। দেখা যাচ্ছে যম ও নিয়ম চরিত্র গঠনের শিক্ষা। এদের ভিত্তি হিসাবে না রাখলে কোন যোগ সাধনাই সাফল্য লাভ করবে না। যম ও নিয়ম দৃঢ় প্রতিষ্ঠ হলে যোগী তাঁর সাধনার ফল অনুভব করতে আরম্ভ করেন। এগুলোর অভাবে সাধনার কোন ফলই ফলবে না।

এইভাবে দেখা যায় স্বামী বিবেকানন্দ মোক্ষ লাভের জন্য চারটি পথের কথা বলেছেন — রাজযোগ, কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ। এর মধ্যে নিঃস্বার্থ কর্মের যোগ বলে যে সঠিক কর্মের মাধ্যমে সমস্যাকারী অহং সমস্যা নিবারক বিষয়ে পরিণত হতে পারে। এর ফলে যিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না, তিনিও নিজের প্রতি অত্যন্ত সততা, নিষ্ঠা এবং নিজের মনের শক্তি দিয়ে মনোনিবেশ করতে পারেন। এছাড়াও কোন কিছুর ফলাফলের কথা না চিন্তা করে, ফল প্রভুর ওপর ছেড়ে দেন। আবার ভক্তিযোগ হল আভ্যন্তরীন শুদ্ধির প্রক্রিয়া। প্রেম সকল মানুষের জন্য অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। এটি শেখায় যে প্রেম বিশুদ্ধ এবং মহাজাগতিক, কিন্তু অহং একে কলুষিত করে ও লালসা, লোভ, হিংসা এবং ক্রোধের মতন নেতিবাচক উপকরণ দেয়। ঈশ্বরের কথা আমাদের সকলের পালনীয় কারণ প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত চিন্তা দেন। তাঁর বাণী উচ্চারণ করলে, সত্য গ্রন্থ অধ্যয়ন করলে সত্য সঙ্গই হৃদয়ের অংশে পর্যবসিত হবে। আবার রাজযোগ অন্তরে আত্মজ্ঞানের শিখা প্রজ্জ্বলিত করে পরমাত্মা লাভের চেষ্টা করায়। যিনি এই পথের সর্বাত্মক অন্বেষণকারী তিনি এই পথ অনুসরণ করবেন যথেষ্ট ধৈর্য্য ও অধ্যাবসায়ের সাথে। এর মাধ্যমে সাধ ও একাগ্রতার প্রক্রিয়ার শিক্ষা পাওয়া যায়। এছাড়াও এটি অস্থিরতাকে মন থেকে অপসারিত করতে সাহায্য করে। এছাড়াও জ্ঞানযোগ তো জ্ঞানের আলোয় অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করে মনের সমস্ত অপবিত্রতাকে সরিয়ে মনকে আলোকিত করে। মন জাগতিক আনন্দের থেকেও আরো উচ্চতর কোন কিছুর আনন্দ লাভ করে। এইভাবেই ধীরে ধীরে মুক্তিলাভ ঘটে।

যদিও বিবেকানন্দ চার প্রকার যোগের স্বতন্ত্র বর্ণনা দিয়েছেন, কিন্তু তাও তিনি বলেছেন এই পথগুলি একই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার ভিন্ন ভিন্ন পথমাত্র। এর মধ্যে চারটি পথ স্বতন্ত্রভাবে বলা হয়েছে। তার ফলে বিভিন্ন মানুষের শারীরিক ও মানসিক গঠন, প্রকৃতি, প্রবণতা এইসব ভিন্ন ভিন্ন হয়। এছাড়াও বিবেকানন্দ আরো বলেন যে কোন ব্যক্তি তাঁর পছন্দ মতন মার্গ নির্ণয় করতে পারেন। যদি এই মার্গগুলির মধ্যে যেকোনো একটিকে সচেতনতা ও আন্তরিকতার সাথে অনুসরণ করেন তাহলে তিনি লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবেন। তাই বিবেকানন্দ বলেন আত্মার অমরত্বের উপলব্ধির জন্য ব্যক্তির আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। এই নিয়ে অবশ্যই ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক দিক থেকে রূপান্তরিত হতে হবে।

এইভাবে যোগদর্শনে যোগ সম্পর্কিত আলোচনা ও স্বামী বিবেকানন্দের যোগ সম্পর্কিত ধারণা এই প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে আলোচিত করে দেখালাম।

গ্রন্থতালিকা:

1) ডঃ সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত (সম্পাদক) — বিবেকানন্দ স্মৃতি, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৬৪।
2) শ্রী বীরেন্দ্র চন্দ্র সরকার — বুদ্ধপ্রসঙ্গে বিবেকানন্দ, তারা প্রেস, কলকাতা, ১৯৬৩।
3) শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ বেদান্তবারিধি — ফেলোশিপ প্রবন্ধ (তৃতীয় খণ্ড), কলকাতা, ১৩৩২।
4) স্বামী বিবেকানন্দ - জ্ঞানযোগ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা ১৯২২।
5) স্বামী বিবেকানন্দ — ভক্তিযোগ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা ১৯২২।
6) স্বামী বিবেকানন্দ — কর্মযোগ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা ১৯২২।
7) স্বামী বিবেকানন্দ — রাজযোগ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা ১৯২২।
8) স্বামী বিবেকানন্দ — বাণী ও রচনা (৩য় খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা ১৯৬০।
9) Basant Kumar Lal—Contemporary Indian Philosophy, Motilal Banarsidass, Delhi, 1992.
10) Jadunath Sinha – Indian Philosophy, Vol-II, Motilal Benarsidass, Delhi, 2006.